Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অন্তর্জলী যাত্রা-র বাক্যকাঠামো বিশ্লেষণ

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Shahrier Rahman
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.3
Pages	৩৯-৫১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অন্তর্জলী যাত্রা-র বাক্যকাঠামো বিশ্লেষণ

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

কমলকুমার মজুমদারের ঔপন্যাসিক গদ্য আধুনিক বাক্যতাত্ত্বিক গবেষণার এক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র — এই আকল্প বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রেরণা। উপন্যাসের গদ্য নিয়ে এই পক্ষপাতের পেছনের কৈফিয়তটি হলো, কমলকুমার যে গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে দশের মধ্যে এগারো হয়ে রয়েছেন তার শুরুটা প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *অন্তর্জলী যাত্রা* থেকেই। এর পরবর্তীকালে কমলকুমারের রচিত বিভিন্ন সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসন করেছে এই উপন্যাসটি, দিয়েছে অননুকরণীয় পথনির্দেশ। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় *অন্তর্জলী যাত্রা*। এর কাছাকাছি সময়ে লেখা গল্পেও এই উপন্যাসের প্রভাব চোখে পড়ে এবং অনিবার্যভাবে সেগুলো লেখা হয় সাধুরীতিতে; অবশ্য এই সাধুরীতি *অন্তর্জলী যাত্রা*-র মতো ধ্রুপদী চিত্রকলাতুল্য স্থাপত্যধর্মী নয়, ছোটগল্প-প্রত্যাশিত হালকা মেজাজ এসব গল্পে স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়। এমনকি তাঁর অন্যান্য উপন্যাস, যেখানে তিনি অনেক বেশি নিরীক্ষা-প্রিয় সেসব রচনায় শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রেখেও প্রথম উপন্যাসের সৃষ্টি-নির্দেশনা প্রচ্ছন্ন নয়। তাছাড়া, কেবল সাধুরীতি-চলতিরীতির দ্বান্দ্বিক বৈচিত্র্য তো নয়, কমলকুমারের ঔপন্যাসিক গদ্যের চলন, ব্যবহৃত বাক্যসমষ্টির অন্তর্শায়িত নান্দনিক তথ্যকাঠামো, বাক্যের গঠন ও পদবিন্যাস পরম্পরা, খণ্ডবাক্যসমষ্টির বিন্যাস প্রভৃতি বাক্যতাত্ত্বিক বিশেষত্ব — এ সকল ক্ষেত্রেই *অন্তর্জলী যাত্রা* ব্যতিক্রমী এক শিল্পগদ্যের আকর। এই উপন্যাসে বিধৃত মানবমনস্তত্ত্ব, নির্মম সামাজিক কৌতুক, বিচিত্র চিত্রকল্পসম্ভার, অদৃষ্টপূর্ব পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং অবশ্যই এর ভাষারীতি প্রভৃতি অনুষঙ্গ নিয়ে পৃথক পৃথক গবেষণা সম্ভব। তবে, বর্তমান আলোচনা উপন্যাসটির সংলাপ-বহির্ভূত বাক্যসৃষ্টির বিশেষত্ব নিরূপণের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

১. প্রাকৃতজনের ধ্রুপদী বাক্য-নির্মাণ

প্রাকৃতিক ভাষার বাক্য বিশ্লেষণই বাক্যতত্ত্বের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। ঔপন্যাসিক গদ্য প্রাকৃতিক ভাষারই অন্তর্গত এক বিশেষায়িত ক্ষেত্র, যার বাক্য-নির্মাণ মূলত উৎসারিত হয় লেখকের চেতনা-তল থেকে এবং সেই গদ্যময় বাক্য-কাঠামো শেষ বিচারে নান্দনিক শিল্পসৃষ্টির প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ থাকে। উদাহরণস্বরূপ *অন্তর্জলী যাত্রা*-র শুরুর অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করা যাক। এই অনুচ্ছেদটি কিংবা এর একটি-দুটি বাক্য বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে [দ্র. অশ্রুকুমার, ১৯৮৮; শোয়াইব, ২০০৯]। তবে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুচ্ছেদটির বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। বলা যেতে পারে, এই অনুচ্ছেদটি *অন্তর্জলী যাত্রা* এবং সেইসঙ্গে কমলকুমার

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মজুমদারের স্বাতন্ত্র্যসূচক গদ্যশৈলীর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ে নেওয়া যাক :

> আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডল মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে। (কমলকুমার, ২০০২ : ৫)[১]

অনুচ্ছেদটি সাধুরীতির, সেটি আর নতুন করে বলার কিছু নেই। এর শুরুর এবং শেষের বাক্যদুটি মূলত অভিন্ন; কেবল ঔপন্যাসিক এ দুয়ের পদক্রম (word order) খানিকটা পাল্টে দিয়েছেন। দ্বিতীয় বাক্যটির ক্রিয়াপদ উহ্য। তৃতীয় বাক্যটি একাধিক খণ্ডবাক্যযুক্ত, যা কিনা হয়ে উঠবে ঔপন্যাসিকের রচিত বাক্যের সাধারণ ছাঁচ। অর্থাৎ, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বাক্য-নির্মাণ নিয়ে কমলকুমার যেসব নিরীক্ষা করবেন তার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে যাচ্ছেন এই অনুচ্ছেদে। বিশেষ করে চোখে পড়ে অনুচ্ছেদটির নামপদগুলো (noun phrase) — 'আলো', 'নভোমণ্ডল', 'রক্তিমতা', 'আমরা' এবং 'প্রাকৃতজনেরা'। এই নামপদগুলো আবার একইসঙ্গে একগুচ্ছ ব্যঞ্জনাময় চিহ্নের দ্যোতক; যা উপন্যাসটির মূল প্রবণতাকে ধারণ করে আছে। শ্মশান-চণ্ডাল বৈজুনাথের মধ্য দিয়ে সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের আলো তিনি উপন্যাসে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেবেন তাকেই তিনি নভোমণ্ডল জুড়ে মৃদু গতিতে রক্তিমতা সঞ্চারী ভোরের আলো ফুটবার চিত্রকল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। আর তা উপভোগ করছে এবং করবে প্রাকৃতজনেরা; লেখক নিজেকেও যাঁদের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, লেখকসহ সকল প্রাকৃতজনের এই নান্দনিক উপভোগ সম্পন্ন হবে 'পুষ্পের উষ্ণতা'য় — বাক্যের যোজক (adjunct) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এক অনাঘ্রাতা কুসুমতুল্য চিত্রকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে বাক্যের গঠনকে করেন অভিনব, অপরদিকে এর বক্তব্যকে করেন গভীরতাসঞ্চারী। গঠনের বিষয়টিই আগে ফয়সালা করা যাক : 'আর অল্পকাল... চিহ্নিত হইব' বাক্যটির প্রথম খণ্ডবাক্যটি কর্তৃবাচ্যের এবং শেষের খণ্ডবাক্যটি কর্মবাচ্যের। একই বাক্যে উভয় প্রকার বাচ্যের সম্মিলন ঘটানোয় ব্যাকরণের আদালতের কাঠগড়ায় তাঁকে হয়তো দাঁড়াতে হবে, কিন্তু পাঠককে এর মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন প্রকৃতি সক্রিয় আর প্রাকৃতজন সে সক্রিয়তার ফলভোগী। একে প্রকাশের লক্ষ্যে যে চিত্রকল্পটি তিনি গড়লেন তার অন্তর্দেশে বাহিত হচ্ছে ইন্দ্রিয় বিপর্যাসের এক অভূতপূর্ব শিল্পানুভব। প্রাকৃতজনের অন্তরে যে নবীন দার্শনিক অনুভবের ফুল তিনি ফোটাতে চেয়েছিলেন তা কেবল চিরায়ত কোমল স্পর্শ-গন্ধই বিতরণ করে না একই সঙ্গে তা উত্তাপও ছড়ায়; যার ওম তাদের নতুন সময়ের কাছে নিয়ে যাবে। প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এসব প্রাকৃত তথা সাধারণ স্বাভাবিক (সামন্ত দৃষ্টিতে হয়তো নীচ-ও) লোকমানবের উষ্ণ জীবনানুভবের কথা তিনি বলবেন, এই প্রতিশ্রুতি লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন প্রথম অনুচ্ছেদেই। সেইসঙ্গে 'আমরা' নামপদটি সেই প্রতিশ্রুতিকে আরও ইঙ্গিতপূর্ণ করে তুলেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে বসে লেখক এমন বহুবাচনিক অনুভব লালন করেন কি কেবল উপন্যাসের ঘটনাকালকে স্মরণে রেখে? না কি প্রাকৃত নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্মতা প্রকাশের প্রয়াস এই ধরনের নামপদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, এই বাক্যগুলো, কমলকুমারের চিন্তা, বিশ্বাস এবং লক্ষ্যের ভাষিক

প্রতিনিধি। তাঁর এই প্রথম অনুচ্ছেদটির বাক্যকাঠামো এবং সেইসূত্রে সমগ্র উপন্যাসের বাক্য ও পদ-বিন্যাস তথা এর গদ্যরীতি *মেঘনাদবধ কাব্য*-র ভাষাকাঠামোর কথা মনে করিয়ে দেয়। মহাকাব্যকে একটি নৃগোষ্ঠীর শেকড়-অভিমুখী শিল্প-বয়ান বিবেচনা করে মধুসূদন চেয়েছিলেন তার উপযোগী সৌধপ্রতিম ভাষাকাঠামো নির্মাণ করতে; আকৃষ্ট হয়েছিলেন শব্দের ওজঃ গুণের প্রতি, আলিঙ্গন করেছিলেন যতির বাধা ডিঙোনো পদ বিন্যাসের প্রবহমানতাকে। কমলকুমারেরও প্রয়োজন হয়েছিল এমনই ধ্রুপদী ভাষাভঙ্গি। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা যেমনই হোক না কেন তাদের চিন্তার ভাষার সাবলিমিটি গগনস্পর্শী। তাই সেই চিন্তার ভাষাকে প্রকাশ করতে এরূপ বাক্য নির্মাণ করা প্রয়োজন। কমলকুমারের সামনে যে গদ্যভাষার আদর্শগুলো ছিল, সেগুলোকে নিঃসন্দেহে তিনি শিল্পপ্রকাশের উপযুক্ত বিবেচনা করেননি। কেন করেননি — তা স্পষ্ট করে বোঝা মুশকিল; কিছুটা হয়ত সকলের থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন বলে; তবে সম্ভবত প্রধান কারণ তিনি প্রাকৃতজনকে মহিমান্বিত অবয়বে শিল্পরূপ দান করতে চেয়েছিলেন। তাই বৈজুনাথের মুখে তিনি তথাকথিত অসংস্কৃত সংলাপ যোজনা করেন, কিন্তু বৈজুনাথ যখন ভাবনায় ডুব দেয়, কিংবা বৈজুনাথের হয়ে লেখক স্বয়ং যখন নিমগ্ন হন তখন যেকোনো সুগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিকের মতোই উচ্চ মার্গে সঞ্চারিত হয় সেই ভাবনা। অনেক আভিধানিক শব্দ আর দার্শনিক মনের জটিল চিন্তাধারার অনুগামী ভাষাভঙ্গি কমলকুমারের কাছে অনিবার্য বলে মনে হয়। তাছাড়া এ কথাও তাঁর জানা ছিল যে, ভাষা পুরোনো হয় যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন ব্যঞ্জনার্থকে ধারণ করতে না পারার ব্যর্থতায়। সাধুরীতি কিংবা পূর্ণবিরতিরহিত দীর্ঘবাক্যের পদবিন্যাস ধারা দেখে যারা তাঁর গদ্যকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে চোখ বন্ধ করে মিলিয়ে ফেলতে আগ্রহী তাদের মন্তব্য আদৌ কি কমলকুমারের ঔপন্যাসিক প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম? তিনি তাঁর উপন্যাসে সন্ধান করেছেন প্রাকৃতজনের দর্শন, তাদের উপলব্ধির গভীরতাকে; আর সন্ধান করেছেন সেই গভীর দর্শনকে ধারণ করবার উপযোগী ভাষা। মধুসূদন যেমন নিজস্ব ভাষারীতির আশ্রয়ে নবজাগ্রত বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-হাহাকারকে শিল্পরূপ প্রদান করেছিলেন, তেমনি কমলকুমার নিজের মতো করে কোনো অনুসরণের ঋণ গ্রহণ না করে আপন বিবেচনায় গড়ে নিয়েছেন প্রাকৃতজনের দর্শনবাহী বাক্য-বিন্যাস। নিচের উদ্ধৃতিতে এর প্রমাণ অনুসন্ধান সম্ভব :

> অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্ত্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; এইস্থানে, বেলাতটে, বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে। (কমলকুমার, ২০০২ : ৫)

'তরল মাতৃমূর্ত্তি যথা' ধরনের পদবন্ধে মধুসূদনের প্রভাব আছে বলে মনে হলেও (শোয়াইব, ২০০৯) সম্ভবত মধুসূদন গঙ্গার মাতৃমূর্তিকে 'তরল' বিবেচনা করতেন না; কেননা এতে উপমান ও উপমিতের সম্পর্ক বদলে দিয়ে যে চিত্র কমলকুমার নির্মাণ করেছেন তা আরও বেশি উত্তরকালের; অন্তত রবীন্দ্রনাথের আগের নয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, নদীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করার রীতি মধুসূদনসহ বহু কবির কবিতায় ব্যবহৃত; কিন্তু মায়ের মূর্তি যা সাধারণভাবে কঠিন আকারসম্পন্ন, তার আকারের প্রথমে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে এবং

তারপর সেই তরল আকার গঙ্গার উপমান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্ত মধুসূদনের রচনায় সুলভ নয়। তারপরও, উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করে এমনটা মনে হতেই পারে যে, চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর পঙ্ক্তি বিন্যাস এতে নেই কিন্তু তবুও ভাবের প্রবহমানতা, মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত পদ যোজনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মধুসূদন সম্ভবত কমলকুমারের অনুসরণীয় ছিলেন। তবে আবারও বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই সাদৃশ্য শব্দ কিংবা বাক্য ব্যবহারে নয় বরং তা ধ্রুপদী নান্দনিকতায়। মধুসূদন বীররস পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে করুণরসে আপ্লুত হন ঠিকই কিন্তু ভাষার শক্তিতে বাঙালি কবিকুলের ব্যক্তিত্বকে পাল্টে দেন। এরপর বাংলা কবিতা যত রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়েই এগোক না কেন ওই ব্যক্তিত্ব রয়ে যায় কবিতার চলার পথের ভিত্তি হয়ে। এদিক থেকে কমলকুমার মজুমদার এতটা সৌভাগ্যবান ছিলেন না। যে গদ্য তিনি নিজের হাতে গড়লেন তার ভালো-মন্দ যাচাইটা খুব ভালোভাবে হলো না। বাংলা উপন্যাসের ভাষায় যে সাবলিমিটি তিনি আনতে চেয়েছিলেন তা তথাকথিত দুরূহতার বেড়াজালে আটকে রইল দীর্ঘকাল। কিন্তু কমলকুমার আসলে লেখাপড়া জানা বাঙালির একান্ত আপন সাহিত্যমাধ্যম উপন্যাসের ভাষাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে, ভাষাকে আক্রমণ করেই সেই ভাষাকে বাঁচাতে হয় (তথ্যসূত্র : অশ্রুকুমার, ১৯৮৮)। কমলকুমার ভাষাকে আক্রমণ করেছিলেন কি না; কিংবা কাজটা ঠিক ছিল কি ভুল ছিল তা-নিয়ে বিতর্কের আশঙ্কা উড়িয়ে না দিয়েও বলা যায়, কমলকুমার প্রত্যাশা করেছিলেন বাংলা উপন্যাসের জগতে এক নতুন ধারা জন্ম নেবে। পরবর্তী ঔপন্যাসিকবর্গ তথা কথাসাহিত্যিকেরা এই গদ্যরীতিই ব্যবহার করবেন এমন চিন্তা মোটেই তাঁর ছিল না। তবে সকলকে জানাতে চেয়েছিলেন, বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাণ, প্রাকৃতজনের চিন্তার ভাষা কতটা উঁচুতে উঠতে পারে। এরূপ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত চিন্তার সংহত প্রকাশ লক্ষ করা যায় *অন্তর্জলী যাত্রা*-র প্রেক্ষাপট বর্ণনায়, কাহিনির এগিয়ে চলায় কিংবা লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত বিবরণে।

২. বাক্যের অন্তঃশায়িত নান্দনিক তথ্যকাঠামো

ভাষাবিজ্ঞান যে বস্তুনিষ্ঠায় ভাষা-বিশ্লেষণ করে, তাতে সৃষ্টিশীল গদ্যের নান্দনিকতা প্রায়শই অনাবিষ্কৃত রয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে বাক্যতত্ত্বের আলোচনায় বাক্যের গঠন-কাঠামোর প্রতি গবেষকের মনোযোগ এতই প্রকট থাকে যে, এর অন্তর্শায়িত বাগর্থদ্যোতনা কেবল ওই কাঠামোর নির্ভুল গঠনের সহায়ক উপাদান হিসেবেই রয়ে যায়। তারপরও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় থাকে না যে, সংজ্ঞাপন-প্রত্যাশী অভীষ্ট বাগর্থদ্যোতনাই বাক্য সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা। আর এই বাগর্থদ্যোতনা সঞ্চারিত হয় যথাযথ তথ্যগুচ্ছকে বাক্যের উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে। *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসের সংলাপ-বহির্ভূত অংশে বিধৃত বাক্যের গঠন বিবেচনায় মূলত এর তথ্যকাঠামো (information structure) বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হবে। এই তথ্যকাঠামোর উপাদান হিসেবেই বিভিন্ন নান্দনিক অনুষঙ্গ এই উপন্যাসের ভাষায় সমন্বিত হয়েছে।

তথ্যকাঠামোর বৈশেষিক লক্ষণ বিবেচনায় বলা চলে যে, বাক্যের উপাদানসমূহকে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত করা সম্ভব; যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়

তথ্যকাঠামো ভিত্তিক বিভাজন হিসেবে। ভালদুভি ও এংডাল [Vallduví & Engdahl (1996, p. 460)]-এর মতে, বাক্যের কাঠামো তৈরিই হয় একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেশ তথা ডিসকোর্স পরিস্থিতিতে যোগাযোগীয় চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে। সাধারণভাবে, একটি বাক্যের তথ্যকাঠামোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় : একটি হলো বিষয় (topic) এবং অন্যটি বিষয়ী (comment)। একটি বাক্যে যে বা যার সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপিত হয় তা হলো ওই বাক্যের বিষয় এবং ওই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা বলা হয় তা হলো বিষয়ী। বাক্যের বিষয় সাধারণত স্বল্প তথ্যসমৃদ্ধ হয় এবং বিষয়ী সাধারণত অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ হয়। রাইনহার্টের (Reinhart, 1995) ব্যাখ্যা অনুসারে, ডিসকোর্স যেহেতু মূলত একটি প্রেক্ষাপটের সেট সেহেতু ডিসকোর্স অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য ওই প্রেক্ষাপট-সংশ্লিষ্ট তথ্যের উপসেট (sub-set) তৈরি করে; আর বাক্যের বিষয় এমনই একটি উপসেটের উপাদান যা বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ের কাছেই পূর্ব-পরিচিত। অর্থাৎ, বিষয় হলো বাক্যের তথ্যকাঠামোর সেই অংশ যা একটি পরিচিত অনুষঙ্গ হিসেবে বাক্যে অবস্থান করে এবং এর সম্পর্কে আরও তথ্য সংযোজনের চাহিদা তৈরি করে। প্রসঙ্গত নিচের উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

ক) বৃদ্ধের দেহে দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর হিজিবিজি। (কমলকুমার, ২০০২ : ৫)

খ) বৈজুর হাস্যধ্বনি শ্রবণে লোকটি ভয়ার্ত্ত হয়, অত্যধিক অস্বস্তি সহকারে তাহার প্রতি সকলেই তাকাইয়াছিল, কারণ এরূপ হাস্য স্থানকালপাত্র ভেদে যারপরনাই অসংযত বলিয়া মনে হয়। (কমলকুমার, ২০০২ : ৭)

ওপরের 'ক' দৃষ্টান্তে উপস্থাপিত বাক্যের বিষয় হলো বৃদ্ধ এবং তার বার্ধক্যের বিবরণ হলো বাক্যটির বিষয়ী। উপন্যাসের ডিসকোর্সে প্রতিটি বাক্যই যেহেতু উপসেট গঠন করে সেহেতু এই বাক্যটিও একটি উপসেট তৈরি করছে। বৃদ্ধ সীতারাম-এর প্রসঙ্গ এই উপসেটের একটি সদস্য হিসেবে সক্রিয়। এই বৃদ্ধ যে সীতারাম তা পাঠকের জানা। তাই লেখক কেবল 'বৃদ্ধ' শব্দবন্ধ ব্যবহারই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন এবং একইসঙ্গে সীতারামের বয়স যে এই উপন্যাসের কাহিনি সংগঠনের অন্যতম মুখ্য প্রপঞ্চ তা-ও কৌশলে পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বাক্যটির বাকি অংশ জুড়ে রয়েছে এই ডিসকোর্স-উপসেটের অন্যতম সদস্য সীতারামের বার্ধক্য বর্ণন; যা বাক্যের বিষয়ী হিসেবে সক্রিয়। লক্ষণীয়, বিষয়ী অংশে লেখক এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন নান্দনিক চিত্রকল্প-প্রতিম বিবরণ। বাক্যের বিষয় উপস্থাপনে লেখক যতটা মৃদুভাষী, বিষয়ীর ক্ষেত্রে তিনি তার চেয়ে অধিকতর ব্যাখ্যাপ্রিয়। তাই একাধিক উপমানের ব্যবহার ঘটিয়ে বাক্যের তথ্যকাঠামোয় সীতারামের বার্ধক্যকে উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ('খ') বিষয় হিসেবে সক্রিয় বৈজু এবং তার হাস্যধ্বনি; বিষয়ী অংশে রয়েছে সেই হাসির সূত্র ধরে অপরের প্রতিক্রিয়া। এখানে লেখক নিতান্ত সরল বর্ণনার অন্তরালে হাসিকে প্রতীকে পরিণত করেছেন। বৈজুর এই হাসি যে, প্রচলিত সমাজ কাঠামোর মানবতা-বিবর্জিত ধর্মান্ধ কর্মকাণ্ডের বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদ তা পরোক্ষে জানিয়ে যান লেখক।

বলে রাখা প্রয়োজন যে, অনেক বাক্যেই বিষয় এবং বাক্যের কর্তা (subject) [যেমন, 'ক' দৃষ্টান্তে] অভিন্ন হতে পারে। তবে, বাক্যের তথ্যকাঠামো যত গভীরতা-সঞ্চারী

ও বিস্তৃত হয় সেই বাক্যের বিষয়ও তত স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে ওঠে। বিষয় ও বিষয়ীর যে বিভাজন ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে তাকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে বিষয়ী অংশটি কোনো বিশেষ তথ্যের ওপর জোর আরোপ করে কিংবা প্রাসঙ্গিক অথচ পূর্বে জ্ঞাত হয়নি এমন তথ্য প্রদান করে। অর্থাৎ, বিষয়ী অংশে উপস্থাপিত তথ্যের এক বা একাধিক উপাদান হয়ে ওঠে সমগ্র বিষয়ীর কার্যকর ও মুখ্য প্রতিনিধি, তথা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উপাদান। বাক্যতত্ত্বে একে অভিহিত করা হয় প্রলোকন (focus) শীর্ষক পরিভাষায়। প্রলোকন, প্রকৃতপক্ষে বিষয়ীর এতই প্রয়োজনীয় উপাদান যা প্রকারান্তরে বিষয়ীর সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তাই বিষয়ীর এই তথ্য প্রদানের বিশেষত্বকে বিবেচনায় রেখে বাক্যের তথ্য কাঠামোকে বিষয় এবং প্রলোকন — এই দুই ভাগেও ভাগ করা সম্ভব; যেখানে বিষয়ীর তথ্য প্রদানের ধরনকেই প্রলোকনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ, বিষয়ী এবং প্রলোকন সমার্থক না হলেও প্রলোকনের সাহায্যে বিষয়ীকে অনুধাবন করা সম্ভব এবং একইসঙ্গে বিষয় ও বিষয়ীর অনুসরণে বিষয় ও প্রলোকন বাক্যিক তথ্যকাঠামো অনুধাবনের ডিকোটমি তথা দ্বিধারিক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। ভাষাবিজ্ঞানী কিস-এর (Kiss, 1998) মতে, দুই প্রকার প্রলোকন লক্ষ করা যায় : বিষয় সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয় এমন প্রলোকনকে বলা হয় অভিনব প্রলোকন (new information focus) এবং বিষয়কে বিস্তৃতরূপে সুচিহ্নিত করে এমন প্রলোকনকে বলা হয় সুচিহ্নায়িত প্রলোকন (identificational focus)। *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসের বাক্য বিশ্লেষণেও এ ধরনের বাক্যিক উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত নিচের কয়েকটি বাক্য দ্রষ্টব্য :

> গ) প্রথম অধীর বৈজুনাথ, আপনার পতিত জমির ন্যায় অনাদৃত বক্ষে হস্ত বুলাইয়া উর্ব্বরতা, আদিম উর্ব্বরতাকে উত্থত করত বেলাতটের ধূসর তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহের মত অসংখ্যের হেতু, প্রক্ষিপ্ত অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। (কমলকুমার, ২০০২ : ১৪)
>
> ঘ) সীতারাম যশোবতীকে দেখিতেই গাল চোষার গতি বাড়িয়া গেল, বৃদ্ধ যেন উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিলেন না, অপ্রকৃতস্থ হইয়া আপনার পুত্রের হাতে মাথা হেলাইয়া দিলেন, কে জানে হয়ত আপনার প্রৌঢ়ত্ব পার হইয়া যৌবনের উপর হেলিয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ২৯)
>
> ঙ) যশোবতী একদৃষ্টে পিতার কথা শুনিতেছিলেন, এই চাহনির মধ্যে এতেক সরলতা ছিল, যে... লক্ষ্মীনারায়ণের মনে হইতেছিল, যশোবতী তাঁহার কথা ঠিক বিশ্বাস করিতেছেন না, ফলে তিনি ঈষৎ নির্ব্বোধ বনিয়া ছোট ছোট অঙ্গ ভঙ্গিমায় তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ৩৩)
>
> চ) যশোবতী খোলামকুচি দিয়া অন্য মনে নির্লিপ্ত ভাবে এতল-বেতল খেলিতেছিলেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ৬৭)
>
> ছ) হরিণনয়না যশোবতী, পবিত্র যশোবতী স্বামীর পদদ্বয় হইতে মস্তক তুলিয়া বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকাইলেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ৬৯)
>
> জ) চণ্ডাল তাহার একটি হাত ধরিয়াছে, সহসা কিসের শব্দ হইল। (কমলকুমার, ২০০২ : ৭৪)

ওপরের দৃষ্টান্তগুলোর বিষয়ী অংশে প্রলোকনের বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষণীয়। 'গ'-দৃষ্টান্তে লেখক বিষয়ী অংশে উপস্থাপন করেছেন বৈজুর প্রতিক্রিয়া; মৃত্যুপথযাত্রী সীতারাম মৃত্যুর

পূর্বে 'দোসর' নেবে — জ্যোতিষীর এমন ভবিষ্যৎ বাণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট। লক্ষণীয়, একটি অতিরিক্ত খণ্ডবাক্য মূল বাক্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল : 'প্রথম অধীর বৈজুনাথ ... প্রক্ষিপ্ত অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।' এই বাক্যে অভিনব প্রলোকনের ব্যবহার লক্ষ করা যায় বিষয়ী অংশের সবচেয়ে সুচিহ্নায়িত উপাদান 'প্রক্ষিপ্ত অঙ্ক'কে ঘিরে। আর যে খণ্ডবাক্যটি লেখক এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে এই প্রলোকিত অংশেরই ব্যাখ্যান। আরও লক্ষণীয় যে, খণ্ডবাক্যটির গঠন ব্যাকরণিকভাবে খুব সুস্পষ্ট নয়। বৈজুর দেহভাষা, তার আচরণের বিবরণ এতে রয়েছে। লেখক যেহেতু বৈজুকে ওই সমাজের ভেতরে থাকা সমাজের বাইরের মানুষ হিসেবে এঁকেছেন, তাই অনাবৃত বক্ষের শ্মশান-চণ্ডালের অন্তরও ওই সমাজে অনাদৃত; আর এ কারণেই তার ভাষা, তার আচরণ দুর্বোধ্য — এমনটাই তো কমলকুমারের লেখক-অভিজ্ঞতা জানান দেয়। এই সামাজিক দূরান্বয়কে কমলকুমার বাক্যের গঠনের মধ্য দিয়ে একীভূত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। লেখক যেন ইচ্ছে করেই বাক্যের প্রলোকিত অংশের যুক্তিভিত্তি খানিকটা বদলে দিয়েছেন এখানে। তবে এর আপাত বিপরীত কৌশলও লক্ষ করা যায়। লেখক তখন আশ্রয় নেন ছদ্ম যুক্তিপূর্ণ ভাষার। নিচের উদাহরণটি দ্রষ্টব্য :

> যদিও 'দোসর' বাক্যের আপনকার সৌন্দর্য বিদ্যমান, যদিও হাটে মাঠে সে বাক্যের নিয়ত প্রতিধ্বনি শ্রুত, যদিও সে বাক্য অনন্ত জ্যোতির্মণ্ডলের এক নির্ঝঞ্ঝাট ত্রিগুণামিতিক বিচিত্র আকর্ষণ; কিন্তু সে বাক্য দেহ ধারণ করিয়াছে। (কমলকুমার, ২০০২ : ১৪)

অর্থাৎ, 'দোসর' এখানে বিষয় আর অবশিষ্ট অংশটি বিষয়ী। লেখক এখানে যুক্তি প্রকাশক সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে গেছেন একের পর এক। কিন্তু বাক্যটি যেভাবে শেষ হচ্ছে তাতে এই যুক্তি-চিহ্নগুলো অপসৃত হয়ে গেছে 'দেহ ধারণ' প্রসঙ্গ আসায়। এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্য দিয়ে এক মুহূর্তে লেখক সীতারাম-যশোবতী-বৈজু-র দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে প্রকটিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। অর্থাৎ, কমলকুমারের বাক্যের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর অভীষ্ট বক্তব্য, আবার এই বক্তব্যকে প্রয়োজন অনুসারে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ করে তোলে বাক্যের তথ্যকাঠামো।

আবারও ফিরে যাওয়া যাক দৃষ্টান্তগুলোর বিশ্লেষণে। 'ঘ' দৃষ্টান্তে লেখক প্রলোকন ঘটিয়েছেন ক্রিয়াপদের। বিদ্রূপের ঝাঁঝ মেশানো বর্ণনায় লেখক পুরুষ আধিপত্যের এই সমাজ কাঠামোতে আসন্নমরণ পুরুষেরও যে নারী বাসনা জাগ্রত হয় তাকেই ক্রিয়াপদের সুচিহ্নায়িত প্রলোকন ঘটানোর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। সুচিহ্নায়িত প্রলোকন সাধারণত উপস্থাপিত হয় বৈপরীত্যের আশ্রয়ে; যেমনটা ঘটেছে এখানে। মৃত্যুপথযাত্রীর আচরণের সঙ্গে বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত সীতারামের 'গাল চোষা'। কিন্তু এমন বৈপরীত্যসূচক প্রলোকনকেই লেখক বাক্যিক ক্রিয়ার সাহায্যে ধাপে ধাপে উপস্থাপন করেন। লেখক পুরুষের কামনার প্রকাশ ঘটান একের পর এক পরস্পর-সম্পর্কিত ক্রিয়াপদযুক্ত প্রায়-পূর্ণবাক্যকে অপূর্ণ যতি চিহ্নের সাহায্যে আবদ্ধ করে। ক্রিয়াগুলোকে লক্ষ করলে মনে হবে যেন এরা একটি আরেকটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করছে। আর সেইসঙ্গে বাক্যের শেষাংশে লেখক নিজেই তাঁর উপলব্ধিকে প্রতীকায়িত করেন জরা আর যৌবনের মিলন-আকাঙ্ক্ষার চিত্র এঁকে। অর্থাৎ, এখানেও লেখক বিষয়ীকে বহুস্তরবিশিষ্ট করে তুলে বাক্যকে পাঠকের

সামনে আপাত জটিল অবয়ব প্রদানের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে লেখক যে দ্বন্দ্বের বিন্যাস রচনা করেন তার আক্রমণের লক্ষ্য প্রাচীন সংস্কার আর শুশ্রূষার লক্ষ্য সেই মরণঘাতী সংস্কারের কবলে পড়া প্রাকৃতজন। এ কারণেই তো ব্রাত্য বৈজুকে তিনি তাঁর প্রতিনিধি করে তোলেন। যশোবতীর দ্বিধা ও সামাজিক সংস্কারকে শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রেখে, সমাজটা পাল্টালো না — এই হতাশ করুণ অনুভূতিতে পাঠক-হৃদয়কে তিনি আর্দ্র করেন। ইতিহাসের সত্যের বাইরের খোলসটি অপরিবর্তিত রেখে কমলকুমার আসলে লণ্ডভণ্ড করে দেন ভেতরের সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বৈজুর ভূয়োদর্শন, তার জীবনবীক্ষা প্রাকৃতজনের অত্যুচ্চ জীবনভাবনার বাহক হয়, মৃতপ্রায় পতির প্রতি যশোবতীর প্রেম-জাগানিয়া অনুভূতির অন্তরালে সমাজের প্রতি এক অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা চিহ্নকে লেখক বাক্য গঠনের সূত্রে তুলে ধরেন। তাই 'ঙ' দৃষ্টান্তের দীর্ঘ ও জটিল খণ্ডবাক্য সংবলিত বাক্যের গঠন কাঠামো যশোবতীর জীবন জটিলতাকে ধারণ করে থাকে। এই বাক্যে যশোবতীর হৃদয়কে বাক্যিক তথ্যকাঠামোর বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে লেখক বিষয়ী অংশে মূলত তার পিতা লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বিধাপীড়িত মানসিকতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাহলে যে ভাঙনের সুর বৈজুর সংলাপে চিন্তায় বারবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে সে অনিবার্য আহ্বান কি লক্ষ্মীনারায়ণও শুনতে পাচ্ছে? তাই যশোবতীর সরল নিষ্ঠাও তার কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে! কমলকুমার এভাবে তাঁর মানসগতিকে বাক্যের গঠন কাঠামোর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তবে, এ কাজটি করতে গিয়ে তিনি যে কেবল দীর্ঘ জটিল বাক্যবন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন তা নয়। তাই দৃষ্টান্ত 'চ', 'ছ' এবং 'জ'-এ সংক্ষিপ্ত অথচ সাংঘাতিক পরিণতির আভাস দিয়ে যান। 'চ' দৃষ্টান্তে বাক্যটির প্রলোকনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'এতল-বেতল' খেলা। লেখক এখানে অত্যন্ত সংহত, অথচ নারীর জীবন যেখানে সমাজপতিদের খেলার উপকরণ — সেই নির্মম বাস্তবতা তাঁর বাক্যবিন্যাসে প্রতিফলিত। এরই ধারাবাহিকতায় 'ছ' দৃষ্টান্তে নারীকে সন্দিহান সতীত্ব নিয়ে মৃতপ্রায় স্বামীর এজলাসে আসামির মতো করে দাঁড়াতে হয়। আর 'জ' দৃষ্টান্তে শ্মশান-চণ্ডালের হাতের ছোঁয়ায় যতই সেই নারীর চোখে নবীন আলোর হাতছানি প্রতিভাত হোক না কেন, 'কিসের শব্দ'ই তার সবটুকু মনোযোগ কেড়ে নেয়। অর্থাৎ আবারও বাক্যের বিষয়ের ওপর আধিপত্য করে বিষয়ী। লেখক বাক্যের যে অংশের অভিনব বা সুচিহ্নায়িত প্রলোকন ঘটান সে অংশে স্থান করে নেয় বর্ণনাধর্মিতা; যা কখনও সংহত কখনও সুদীর্ঘ ও সম্প্রসারিত। 'গ' থেকে 'জ' দৃষ্টান্তগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, লেখক তাঁর ব্যবহৃত বাক্যের তথ্যকাঠামোকে বিন্যস্ত করেছেন স্তরবহুল বিবরণধর্মিতায়। কেননা, 'চ', 'ছ' কিংবা 'জ'-সদৃশ বাক্য স্মরণে রেখেও বলা চলে যে, *অন্তর্জলী যাত্রা*-য় দীর্ঘ বাক্যেরই আধিপত্য। আর এ ধরনের দীর্ঘ বাক্যের সামান্য লক্ষণ হলো এর বিষয়ী অংশের দীর্ঘ বর্ণনাত্মক উপস্থাপন। অর্থাৎ, লেখক সমগ্র উপন্যাসেই প্রাকৃতজনের পরিবর্তমান অনুভবকে ব্যাখ্যা করার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। এ কারণে যে বিষয়েই তিনি কথা বলতে আগ্রহী হন তাকে যথেষ্ট ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ না করলে তাঁর অতৃপ্তি ঘোচে না। তাছাড়া বিশ শতকের শেষের দিকে এসে শতাব্দী-প্রাচীন সর্বজন জ্ঞাত একটি বিষয় নিয়ে যখন কোনো ঔপন্যাসিক লেখা আরম্ভ করেন, তাঁর কাছে তো ঘটনার রহস্যঘন ক্লাইম্যাক্সের সফল পরিণতি প্রত্যাশিত হতে পারে না। ফলে, স্বভাবতই লেখক পাল্টাতে বসেন ওই ঘটনায় অংশ নেয়া কুশীলবদের ভূমিকা।

ফলে, বৈজু আবির্ভূত হয় সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়, কন্যা দায় মাথায় নিয়েও লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ সন্তানকে সতীদাহের দিকে ঠেলে দিতে চরম দ্বিধায় জর্জরিত হয়, যশোবতী আর চিন্তাশক্তি রহিত কোনো একজন সতী না হয়ে প্রথা ও নীতির দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ একজন মানুষে পরিণত হয়। এই এতসব পরিবর্তন উপন্যাসে ঠাঁই পায় ভাষার আশ্রয়ে। লেখক বাক্যের তথ্যকাঠামোয় নানাবিধ পরিবর্তন এনে এই উপন্যাসকে নান্দনিক অবয়ব প্রদানে সচেষ্ট হন।

৩. বাক্যিক পদবিন্যাস পরম্পরা

বাংলা বাক্যের পদক্রম সাধারণভাবে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার বিন্যাস দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কমলকুমার অন্তত *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসে মোটের ওপর এই পদক্রমই অনুসরণ করে গেছেন। কিন্তু অন্বিষ্ট বক্তব্যের গতিপ্রকৃতি অনুসারে এই পদক্রমের কাঠামোর ভেতরেই নানা পারমুটেশনে তিনি বাক্যের যোজক অংশের অনুপ্রবেশ ঘটান। এতে করে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার সরল বিন্যাসটি আর সুস্পষ্ট থাকে না। বাক্যের যোজকগুলো যেহেতু বাক্য গঠনের অনিবার্য উপাদান নয়, বরং বাক্যের তথ্যকাঠামোর ব্যঞ্জনাময় সম্প্রসারণের আয়ুধ সেহেতু নিয়ম ভাঙার নিয়ম তৈরি করে কমলকুমার বিবিধ পদবিন্যাস সৃজন করেছেন। এর সপক্ষে দু-একটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া যেতে পারে :

> ডুলির মুখের পর্দায় 'অযোধ্যায় রাজকর্ম্ম ব্যাপৃত রামচন্দ্র পার্শ্বে সীতা' ছাপা, সেখানে, ইহার সম্মুখে লক্ষ্মীনারায়ণ দাঁড়াইয়া আপন কন্যাকে আহ্বান করিলেন... (কমলকুমার, ২০০২ : ২৭)
> কিংবা
> যশোবতী, তুলসী চারাটি তাঁহার কাছে লইয়া যাইতেই গাছটি নিকটে পাইয়া বৃদ্ধ যেন উচ্ছ্বসিত; তিনি কী অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহা আর স্মরণ ছিল না। (কমলকুমার, ২০০২ : ৪৬)

ওপরের দুটি উদাহরণেই যোজক অংশগুলো বাক্যের মুখ্য আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। ফলে, কর্তা এবং কর্ম যেন প্রায়-নিভৃতে বাক্যে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে শেষের উদাহরণটিতে, প্রথম খণ্ডবাক্যটি ক্রিয়াহীন এবং দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটিতে কর্তা ও ক্রিয়ার সংগতি বিধানও যথাযথভাবে হয়নি। লেখক অবশ্য, বিষয়ীর নানা উপাদানকে প্রলোকনের সাহায্যে বেশি করে নজরে এনে এসব ত্রুটি ঢেকে ফেলেন। তাছাড়া, এসব চুলচেরা ব্যাকরণিক হিসাব নিয়েও কমলকুমার ব্যস্ত থাকতে আগ্রহী ছিলেন না মোটেই। তিনি তো মূলত আবেগ প্রকাশের উপযোগী ভাষা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই মন্তব্যের প্রমাণ মিলবে।

৪. ক্রিয়াপদের ব্যবহার-বৈচিত্র্য

অন্তর্জলী যাত্রা-য় ক্রিয়াহীন বাক্য কিংবা খণ্ডবাক্য যেমন রয়েছে; ক্রিয়ার কাল ব্যবহারেও তেমনি রয়েছে নানাবিধ আপাত অসংগতি। 'আপাত' বলা হলো এ কারণে যে, এই অসংগতিগুলো ব্যাকরণের অনুশাসনের বরখেলাফ হলেও নান্দনিক ব্যাখ্যা-বিচ্যুত নয়। কমলকুমার সাধারণভাবে 'হ-ধাতু'-র সাহায্যে গঠিত ক্রিয়ারূপগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই

বর্জন করেছেন। বাংলা গদ্যের জন্য এটি এমন কোনো অভিনব ঘটনা নয়; বাঙালির কথ্য গদ্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত নিয়মিতই চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর যে কাজটি অনিবার্যভাবে ব্যাখ্যা দাবি করে তা হলো, বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার অ্যাসপেক্ট তথা বিধা সংশ্লিষ্ট অসংগতি। নিচের দৃষ্টান্তগুলো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক :

> যশোবতীর সঘন, উপর্য্যুপরি নিঃশ্বাসে কবরী খুলিয়া গেল, তাহার মস্তক আন্দোলিত হয়। (কমলকুমার, ২০০২ : ৪৮)
>
> 'আয় আয়' ধ্বনি তাঁহার গাত্রে যেমত লাগিয়া যাইতেছে, তিনি বিরক্ত একারণে যে, বড়ই তাঁহার অসোয়াস্তি হইতেছিল, এবং ঠিক এই সময়ই কাহার গলার স্বর, ক্রমাগত কথার স্রোত শুনিয়াই সচকিত হইয়া প্রথমে নির্লিপ্ত, পরে আগ্রহের সহিত অনুধাবন করিতে সচেষ্ট হইলেন, তাঁহার কর্ণমূল রক্তিম হয়। (পৃ. ৭২)
>
> বায়ু স্থির, পাখীরা উড়িয়া গেল, ধরিত্রীর বক্ষে কে যেন হাঁটু ডলিতেছে। (কমলকুমার, ২০০২ : ৭৪)

ওপরের দৃষ্টান্তগুলোতে দেখা যাবে যে, একই বাক্যস্থিত খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে প্রায়শই কালগত ঐক্যবিধান করেননি কমলকুমার। প্রশ্ন হলো কেন? আগেই বলা হয়েছে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের কড়া প্রেসক্রিপশন তাঁর প্রতি সদয় হবে না মোটেই। কিন্তু দেখার বিষয় হলো, শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত বাক্যগুলো যথার্থ ভাব প্রকাশে সমর্থ কি না। আর সেদিক থেকে বলতে গেলে এই বাক্যগুলো কেবল সার্থকই নয়, একইসঙ্গে বিশেষ ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত। সর্বোপরি বাক্যগুলো প্রায়শই চিত্রকল্প আশ্রয় করে প্রতীক নির্মাণ করে এবং উপন্যাসের মূল দর্শনের অণু-অনুভবকে লালন করে চলে। যেমন : যশোবতীর কবরী খুলে যাওয়া হয়ত প্রতিনিয়ত ঘটে না তাই এই খণ্ডবাক্যটি অতীত কালের ক্রিয়ার ভিত্তিতে নির্মিত; কিন্তু শেষের খণ্ডবাক্যটিতে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়া ব্যবহারই কমলকুমারের কাছে যথোপযুক্ত; কেননা, যশোবতীর স্বোপার্জিত উপলব্ধি এবং সমাজদত্ত সংস্কারের আন্দোলন তো নিয়ত বর্তমানের ঘটনা; তাই 'মস্তক আন্দোলিত হয়'। একইভাবে পরের উদাহরণের শুরুতে ইন্দ্রিয় বিপর্যাসজাত যে চিত্রকল্প নির্মিত হয়েছে তাকে ঘটমান রাখা যেমন লেখকের জন্য জরুরি ছিল তেমনি অসোয়াস্তির অনুভবকে অতীতের বিষয়ে পরিণত করাও ছিল আবশ্যক; তা না হলে বৈজুনাথের আকুল আহ্বান তাঁর বোধকে কিছু সময়ের জন্য হলেও দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ করবে কিভাবে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই বাক্যের শেষ দুটি খণ্ডবাক্যের তুলনা করলে; যেখানে যশোবতী সেই আহ্বান শুনতে সচেষ্ট হলো (অর্থাৎ অতীত হয়ে গেল) অথচ তার কর্ণমূলের রক্তিম বর্ণধারণ অব্যাহত রইল (অর্থাৎ ঘটেই চলল)। তাই যশোবতী অন্তর্জলে শেষ যাত্রা করলেও উপন্যাসের সর্বশেষ বাক্যে কমলকুমারকে বলতে হয়: '... কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল।' এরূপ নান্দনিক বিশ্লেষণে ক্রিয়া ব্যবহারের অসংগতিগুলোকেই অনিবার্য বলে গ্রহণ করে নিতে হয়। এমনকি শেষ দৃষ্টান্তটিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায়। লক্ষ রাখার বিষয়, বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো কিভাবে চিত্রকল্পটিকে পূর্ণতা দান করেছে। এটি কখনই সম্ভব হত না যদি কমলকুমার এই বাক্যটিতে ক্রিয়ার কালগত সংগতি রক্ষা করতে যেতেন। স্থির বায়ু গুমোট অবস্থা তৈরি করার মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুর সংস্কার-শৃঙ্খলিত ওই সমাজের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই

সমাজকে পাল্টে দেওয়ার প্রেরণা থেকেই কমলকুমার কোটালের প্রতীক ব্যবহার করেন; যেন জলোচ্ছ্বাসে সব শৃঙ্খলকে ভাসিয়ে নিতে চান তিনি বৈজুনাথের অন্তর্যামী হয়ে। এই মহা-আন্দোলনে সমাজের সুখের পাখিরা শরিক হয় না; ক্রিয়া ব্যবহারে তাই তারা অতীত। ঘটমান বর্তমানে কেবল রয়ে যায় ধরিত্রীরূপী যশোবতী আর তার মুক্তির আহ্বানকারী বৈজু। জলোচ্ছ্বাস-আসন্নপ্রায় পৃথিবীর বুকে 'হাঁটু ডলে' বৈজু মূলত তার দৃপ্ত অস্তিত্বকেই জানান দেয়। এমন অনুষঙ্গকে কমলকুমার কেবল অতীত কালের ক্রিয়া দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? তাই তাঁকে ক্রিয়ার কালের ব্যাকরণিক সংগতিতে ছেদ টানতেই হয়।

৫. খণ্ড বাক্যসমষ্টির বিন্যাস

ইতোমধ্যে যেসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই বাক্যিক গঠন দীর্ঘ এবং একাধিক খণ্ডবাক্য সংবলিত। আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমলকুমার বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে মূলত অনুসরণ করেছেন তাঁর চিন্তাপ্রবাহের পথ-নির্দেশনা। অর্থাৎ, প্রাকৃতজন যেভাবে ভাবে, তিনিও সেভাবে ভাবতে চেয়েছেন। সেই ভাবনাকে প্রায়-অপরিবর্তিত রেখেই তিনি উপন্যাসে তার শিল্পযোজনা সম্পন্ন করেছেন। এ কারণেই উপন্যাসটির এগিয়ে চলা অনুধাবন করতে গেলে নিবিড় পাঠের প্রয়োজন হয়। কমলকুমার তাঁর গদ্যভাবনায় প্রবহমানতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রবহমানতা চিন্তার, মানব দর্শনের। লেখক যেন মনের ছবিগুলোকে উপন্যাসের পাঠে এঁকে চলেন। 'ভাষাকে চিত্র রচনার কাজে লাগাতে চেয়েছেন তিনি' (পূর্ণেন্দু, ২০১৩ : ১৬০)। এই চিত্র আঁকার উপায় হিসেবে তিনি ভাষায় খণ্ডবাক্য যোজনা করেন। এই খণ্ডবাক্যগুলো যেন আসলে এক একটি রঙের শেড। লেখক যে জীবনছবিটি ফুটিয়ে তুলতে চান তার অবয়বটি তিনি স্পষ্ট করেন খণ্ডবাক্যগুলোর শিল্প সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে। নিচের অনুচ্ছেদটি এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে :

> অন্তবন্ত, অন্তরঙ্গ এ দেহ যে বৈরাগ্য আনিবার পক্ষে যথেষ্ট অঢেল তাহা অতিবৃদ্ধ সীতারামের দেহের প্রতি তাকাইলেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়; তদ্দর্শনে, আপনার হস্ত হইতে শিশুর কপোলস্পর্শজনিত যে রেশমী অনুভব তাহা অচীরেই উধাও হইবে; আপনার সকল স্মৃতি–একদা হয়তো যে মানসবেগ চম্পকে জড়াইয়াছিল, কখন হয়ত দূর পথশ্রমের পর — স্রোতস্বিনী দর্শনে যে শান্তি অনুভব, অথবা পরিপ্রেক্ষিত হইতে সৃষ্ট হইয়া ক্রমে দিনের আলোয় ভাঙিয়া পড়া যেমন বুদ্বুদের চরিত্র এবং তাহা অনুধাবনে মানুষ যেমন বিনয়ী হইতে গিয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছে — এই সকল স্মৃতি মাত্রই ভ্রংশ হইবে এবং দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত আপনাকে নিশ্চিত বারম্বার বলিতেই হইবে, হায় এ-দেহ কি গোলাপের অন্যতম দীর্ঘতম পুরস্কার! এবং অজানিতের প্রতি বালকের মতোই, আপনার অনার্য্য অভিমান জন্মিবে। (কমলকুমার, ২০০২ : ৫)

এই অনুচ্ছেদে বাক্যের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ১টি। যদিও শেষের দিকে একটি আশ্চর্যবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে পূর্ণযতির সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল কিন্তু এর পরের অংশটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র বাক্য না হয়ে ওঠায় সব মিলিয়ে একটি বাক্যই পাঠকের সামনে প্রতীয়মান হয়। এই

হিসাবে বাক্যটির শব্দ সংখ্যা ১০৬; বিষয়টি রীতিমত বিস্ময়কর। কিন্তু কমলকুমার পাঠকের ক্লান্তি দূর করতে একের পর এক নবীন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন; সাহায্য নেন নানাবিধ উপমানের। লক্ষ করলে স্পষ্ট হবে যে, এর অন্তর্গত খণ্ডবাক্যগুলো অনায়াসেই ভিন্ন ভিন্ন বাক্য হতে পারত; তা হলে হলো না কেন? কমলকুমারের শিল্পচিন্তায় তাহলে যে বাধা পড়ে। অনুচ্ছেদটি এক টানা পড়ে গেলে মনে হয়, লেখকের মননে একটার পর একটা অনুভব জেগে উঠছে আর তা তিনি থরে থরে সাজিয়ে রাখছেন, গোলাপের তোড়া বানাবার মতো। তাই কোনো একটিকে পৃথক করে রাখার উপায় নেই; তাহলে তো তোড়া বাঁধবে না।

উল্লিখিত খণ্ডবাক্য ব্যবহারের দৃষ্টান্তে আরেকটি চোখে পড়ার মতো বিষয় হলো, খণ্ডবাক্যগুলোর ক্রিয়াপদ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট; আর তাই এত দীর্ঘ বাক্যও পাঠকের হৃদয়াঙ্গমে বিঘ্ন ঘটায় না। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসে এমন অনেক দীর্ঘবাক্য আছে যেখানে খণ্ডবাক্যগুলো আপাতভাবে ক্রিয়াহীন; ফলে বাক্যের বক্তব্য কখনও কখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়। এটিও যে কমলকুমারের সচেতন শিল্প-প্রয়াস তা-ও ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে। লেখক যখন মানব মনের জটিল ভঙ্গিকে ভাষারূপ দিতে আগ্রহী হন তখন ইচ্ছে করেই বাক্যের অনুধাবনযোগ্যতাকে প্রচ্ছন্ন করে দেন। নিচের উদ্ধৃতিটি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :

> যশোবতী স্বচক্ষে সেই পবিত্র স্রোতোধারা দেখিয়াছিলেন; এখন মুগ্ধ, তিনি মনে মনে আকাশ লইয়া খেলিতে মুখর বাঙ্ময়; যে অমরতা লইয়া ইহজগত, তাহার আলো তাহার পুষ্পরাশি নয়ছয় করিয়াছে, কাব্যে যাহা ছন্দ-মিলের ধ্বনি মাত্র, সুশীল ও সুবোধ মানুষের মৃত্যুতে যাহা সান্ত্বনা বচন, তাহা, এখন, এই খেলার বস্তু এবং যাহা যশোবতী অবোধ পৃথিবী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (কমলকুমার, ২০০২ : ৩৪)

এই বাক্যের অন্তর্গত খণ্ডবাক্যগুলোর ক্রিয়া প্রায়-ক্ষেত্রেই উহ্য এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন সংযোজক অব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত। ক্রিয়াসমূহ উহ্য থাকায় খণ্ডবাক্যের বাগর্থ অনুধাবন কখনও কখনও কষ্টসাধ্য হয়। কিন্তু কমলকুমার তো একটি আদর্শই মেনে চলেন; আর তা হলো চরিত্রের মনোগতিপথের অনুসরণ। সামাজিক সংস্কার চেতনা যশোবতীকে নিয়ে এমন এক খেলায় মেতে উঠেছে যা মর্মান্তিক অথচ নিরবচ্ছিন্ন। তাই তার অনুভূতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে না; বরং একের সঙ্গে অপরটি জুড়ে থাকে। ফলে, কমলকুমার এক সমাধানহীন শিল্পসমস্যায় নিপতিত হন। কেননা, ঔপন্যাসিক বক্তব্যের প্রবহমানতার কথা বিবেচনায় এনে তিনি খণ্ডবাক্য গুচ্ছাকারে একই বাক্যসীমায় প্রবিষ্ট করেন। আবার, খণ্ডবাক্যের আধিক্য তার সৃষ্ট বাক্যকাঠামোর বোধগম্যতাকে জটিল রূপ দান করে। এক্ষেত্রে কমলকুমারের পক্ষপাত অবশ্য খণ্ডবাক্য সমৃদ্ধ মনোগতির প্রবহমান উপস্থাপনের পক্ষে। তাই তিনি অপূর্ণ যতি চিহ্নের সমাহার গড়ে তোলেন। পাঠককে জানিয়ে দেন যে, তার বলার কথা এখনও শেষ হয়নি। পাঠককে ভাবনার দোলায় আন্দোলিত করতে আগ্রহী হন।

৬. উপসংহার

বাক্যবিন্যাস কমলকুমারের শিল্পায়ুধ। তিনি লিখেছেন প্রাজ্ঞ পাঠকের জন্য। পাঠকের প্রতি এক অভূতপূর্ব আস্থা রেখে তিনি তাঁর শিল্প-উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। *সুহাসিনীর পমেটম* কিংবা *পিঞ্জরে বসিয়া* শুক উপন্যাসের ভাষার বাস্তবতা যেখানে প্রায়-বিমূর্ত অনুভবে রূপান্তরিত হয়েছে বারবার, *অন্তর্জলী যাত্রা* সেই তুলনায় অনেক বেশি 'ঘোর বাস্তব'। এই উপন্যাসে কমলকুমার প্রাকৃতজনের জন্য এক সাবলাইম ভাষাকাঠামো নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন। তিনি মূলত প্রাকৃতজনের ধ্রুপদী ভাবনাকে ধ্রুপদী বাক্যবিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পরূপ দান করতে চেয়েছেন। তাঁর অধ্যাত্ম চিন্তা তাঁকে জীবন-স্বরূপের সন্ধান দিয়েছিল। সেই জীবন-স্বরূপ তো কোনো তুচ্ছ লঘু বিষয় নয়। তাই তাকে লঘু ভাষায় ধারণ করাও তাঁর কাছে সমীচীন বলে বিবেচিত হয়নি। *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছিলেন, 'জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন'। এই ঈশ্বর কিন্তু পরলোকের বাসিন্দা নয়; ইহলৌকিক মানব জীবন সেই দর্শনের আধার। তাই তিনি মানুষের দার্শনিক উচ্চতাকে স্পর্শ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি *অন্তর্জলী যাত্রা*-য় যে ভাষা ব্যবহারের সূচনা ঘটিয়েছিলেন, তাকে বিবিধ মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে, গল্পে। কোথাও হয়ত নিরীক্ষা মাত্রা ছাড়িয়েছে; ভাষার ওপর 'আঘাত'টা হয়ে পড়েছে অনেক ভাষীর কাছেই অসহনীয়। তারপরও এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে ওঠে যে, ভাষাকে 'আঘাত' করে তিনি ভাষাকেই 'বাঁচাতে' চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর সফলতা নিয়ে সকল প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয়নি। তবে, বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার যে অতিপ্রয়োজনীয় এক অধ্যায় তা বিভিন্ন গবেষণায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে; কেননা, 'আলো ক্রমে আসিতেছে'।

গ্রন্থপঞ্জি

অশ্রুকুমার সিকদার (১৯৮৮)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা : অরুণা।

কমলকুমার মজুমদার (২০০২)। *উপন্যাস সমগ্র*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

পূর্ণেন্দু পত্রী। (২০১৩)। "কমলকুমারের রচনা শিল্পে শিল্পকথা", শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *কমলকুমার : সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে* গ্রন্থভুক্ত, কলকাতা : প্রকাশ ভবন।

শোয়াইব জিবরান (২০০৯)। *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

Kiss, K. E. (1998). "Identificational focus versus information focus". *Language, 74*, 245-273.

Reinhart, T. (1995). "Interface strategies", *OTS Working Papers in Theoretical Linguistics 02-001*. Utrecht : OTS, Utrecht University.

Vallduvi, Enric; Elisabet Engdahl. (1996). "The linguistic realization of information packaging". *Linguistics 34*, 459-519.